OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 17 - 26
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চৈতন্য বিষয়ক প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sunimaghosh70@gmail.com
ও
রেশমিকা পারভীন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : resmikaparvin2017@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Chaitanyadev, Little Magazine, Regional culture, Gour, Ramkeli, Rup-Sanatan.

Abstract
A Little Magazine reflects the rich and diverse essence of Bengali creativity and introspection. It offers a platform for writers and poets to freely share their deepest emotions and thoughts. Though small in size, these magazines carry extensive ideas and innovative perspectives. They have played a crucial role in shaping Indian literature, particularly Bengali literature, by going beyond mainstream literary traditions. These magazines capture the essence of regional culture, customs, rituals and folklore in an organic and straightforward way. The same is true for the Little Magazines of Malda district.

Malda, located in the remote part of West Bengal, often lags in areas like education, healthcare and economy. Yet, through these Little Magazines, writers and poets strive to highlight the district's history. One significant historical focus is the arrival of Chaitanyadev in Gour. Chaitanya visited Gour on Jyeshtha Sankranti in the year 912 of the Bengali calendar, which corresponds to June 1515 in the Gregorian calendar. This event is vividly described in essays published in Malda's Little Magazines.

While major biographies of Chaitanya, such as 'Chaitanyabhagavat', 'Chaitanyacharitamrita', and 'Chaitanyamangal', touch upon his visit to Gour briefly, the essayists of Malda have gone beyond these texts. They have gathered additional details and explored different perspectives on his journey. These essays also delve deeply into the socio-economic and political conditions

of Gour during Chaitanya's time, the history of Ramkeli, and his association with Rup and Sanatan.

The essays in Malda's Little Magazines provide valuable insights into Chaitanyadev's life, his impact on society, and his contributions to literature. They help readers distinguish between historical facts and legends, while also exploring instances where history and legend intertwine to form new interpretations. Since Chaitanya's visit, an annual fair has been held in Ramkeli on Jyeshtha Sankranti to honor his memory. This fair attracts visitors from across India and abroad, boosting local trade and commerce and emphasizing Chaitanya's lasting influence. These essays have significantly enriched the study of Bengali history, especially regarding Chaitanyadev's legacy. Their importance in understanding his life and its impact on society and culture cannot be overstated.

Discussion

> "চিন্তাধারাকে লুকিয়ে রাখার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই, তা প্রকাশ করতে যদি লজ্জাবোধ হয়, তবে সে ধরনের চিন্তা না করাই ভালো।"
>
> — প্রাচীন গ্রিক কবি ইউরিপিদিস

প্রকাশের এই তাগিদ থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের উদ্ভব। লিটল ম্যাগাজিন হলো বাঙালির আত্মানুভূতির বহুরৈখিক প্রাণস্পন্দন। এখানে লেখক ও কবিগণ নিজের আত্মানুভূতি স্বাধীনভাবে বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন। তাই লিটল ম্যাগাজিন 'লিটল' হলেও ভাবনায় বৃহৎ এবং ব্যঞ্জনায় অভিনব। এই লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্য। তাই সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গ এলে যে নামটি সর্বাগ্রে আসে সেটি হল লিটল ম্যাগাজিন। প্রচলিত সাহিত্য ধারার বাইরে মুক্তচিন্তা ও আন্দোলনের ফসল এই লিটল ম্যাগাজিন। এখানে প্রান্তিক অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, আচার-আচরণ কিংবা কোনো ঐতিহাসিক স্থানের নানান লোককথা সাবলীলভাবে ফুটে উঠে। মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য।

মালদার সুসন্তান রাধেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদনায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুসুম' পত্রিকার মাধ্যমে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনের পথ চলা শুরু। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনগুলির ধারা অব্যাহত। সেই সূত্রে জেলা এবং জেলার বাইরের বহু খ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম ঠাঁই পেয়েছে জেলার লিটল ম্যাগাজিনে। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলা মালদা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পিছিয়ে থাকা জেলা হিসেবে এখানে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর যে লড়াই, সেই লড়ায়ের মধ্যেই নিজের জেলার ইতিহাসের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখকরা। সেই ইতিহাসচর্চার মধ্যে অন্যতম হলো গৌড়ে চৈতন্যদেবের আগমন পর্বটি।

প্রাচীন বাংলায় উত্তর-পূর্ব ভারতের এক স্বীকৃত রাজধানী ছিল গৌড়। পাটলিপুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গৌড় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। গৌড়ের প্রতিষ্ঠা করেন প্রাচীন বাংলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক। তারপর দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে রাজধানী হিসেবে ঐতিহ্য বহন করেছে এই গৌড়। বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান নৃপতিগণ গৌড়ের সিংহাসনে বসে রাজ্যের রাজকার্য ও শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ-সংঘর্ষও করেছেন। তাই গৌড়ভূমি কখনও রণক্ষেত্র, কখনও বধ্যভূমি, কখনও বা মন্ত্রণাগৃহে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কোনো রাজাই তাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। গৌড়ভূমিকে সেই সম্মানের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন একমাত্র চৈতন্যদেব। গৌড়ের শাসকরা পাঁচশো বছরে যা করে যেতে পারেননি, শ্রীচৈতন্যের কয়েক দিনের পাদস্পর্শে গৌড়কে সর্বভারতীয় পরিচিতি ও সম্মান এনে দিয়েছে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের আগমনের ফলে গৌড় তথা মালদার সংস্কৃতিতেও এসেছে নতুন জোয়ার। তাঁর এই আগমনের ইতিহাসটিকে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকগণ নিখুঁত ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের প্রবন্ধে। নিম্নে এই বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হল —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবন্ধের নাম	প্রাবন্ধিক	পত্রিকা	প্রকাশকাল
গৌড়ীয় ধর্মদর্শন ও শ্রীচৈতন্যের আদর্শ-প্রসারে রামকেলি	দিলীপকুমার দত্ত	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলিতে ভক্তি আন্দোলন : শ্রীচৈতন্য, রূপ-সনাতন	গোপাল লাহা	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
শ্রীচৈতন্যের রামকেলি আগমন : এক অচর্চিত ইতিহাস	লায়েক আলি খান	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলি পরিচয়	কল্যাণ মুখোপাধ্যায়	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ	সুখেন্দুশেখর রায়	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
শ্রীচৈতন্যের গৌড় পরিক্রমা	অনন্যা গোস্বামী	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
গৌড়নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ	কেদারনাথ গুপ্ত	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলি গ্রাম ও শ্রীচৈতন্যদেব — এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সুস্মিতা সোম	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
উজ্জ্বলনীলমণির খোঁজে গৌড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ	আইরিন শবনম	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রামকেলিতে চৈতন্যদেবের আগমন : সময় থেকে সময়ান্তরে	বিকাশ রায়	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
সাধনতীর্থ রামকেলির পথে পথে	রাধাগোবিন্দ ঘোষ	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
গৌরগরবিনী এ গৌড় রাজধানী	ফণী পাল	উৎসারিত আলো	৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - অক্টোবর ২০১৩
রূপ ও সনাতন যখন গৌড় মালদায়	কমল বসাক	গৌড় মালদা সংবাদ	শারদীয়া ১৪১২
শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে আগমনের পেছনে কী কোন গোপন অভিসন্ধি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল?	অরুণ কান্তি ভট্টাচার্য	গৌড় মালদা সংবাদ	শারদীয়া ১৪১৫

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব একজন মাইলস্টোন এবং বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ শতাব্দী চৈতন্যের নামানুসারে করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ‘চৈতন্য যুগের’ আগের ও পরের সময়কে বলা হয়ে থাকে ‘চৈতন্য পূর্বযুগ’ ও ‘চৈতন্য উত্তরযুগ’। বাঙালি জাতির এক মহাসংকট কালে আবির্ভূত হয়ে, সেই জাতির ক্ষয়িষ্ণু, হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতি থেকে আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন তিনি। একা একজন ব্যক্তির পক্ষে এতটা প্রবল শক্তি সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু চৈতন্যদেব তা করে দেখিয়েছেন। চৈতন্য জীবনীকার, গবেষক এবং ইতিহাসকারেরা চৈতন্যের জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন — গৌড় পর্ব, পরিব্রাজক পর্ব, নীলাচল পর্ব।[১] জীবনের শুরুর দিন থেকে চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় গৌড় পর্ব। মধ্যযুগে বঙ্গদেশের নাম ছিল গৌড়। গৌড়ের সীমানা অনেকখানি স্থান জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল।

তাই চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের নাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম'। দ্বিতীয় পর্ব হলো পরিব্রাজক পর্ব। এই পর্বে তিনি তাঁর জীবনের পাঁচটি বছর দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, মথুরা-বৃন্দাবনসহ বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেছেন। এই পর্বেই চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে এসেছিলেন। তৃতীয় এবং শেষ পর্বটি হল নীলাচল পর্ব। জীবনের শেষ আঠারো বছর তিনি নীলাচল তথা পুরীতে অতিবাহিত করেন।

জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বে দক্ষিণ ভারত ও নীলাচল পরিভ্রমণের পর বৃন্দাবন যাবার পথে গৌড় তথা মালদহে ক্ষণকালের জন্য আসেন তিনি। চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের নানান উদ্দেশ্য ছিল। তবে চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের পূর্বে গৌড়ের কিঞ্চিত ইতিহাস উল্লেখ করা প্রয়োজন। তৎকালীন সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে একদিকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের শোষণ পীড়ন, আর একদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ। মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা সে কথায় বলেছেন —

> "তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় উচ্চবর্ণের মানুষের শোষণের শিকার হয়েছিল নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠী। সমাজে মর্যাদা পাননি তারা। ...অপারদর্শী, অসংস্কৃত নিম্নবর্গের হিন্দুর এবং ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে হতাশা, ঘৃণা ও ব্যর্থতার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। বঙ্গে ইসলামের আগমন এবং মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালে বা প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসকবর্গ এবং ধর্মপ্রচারক রাজশক্তি সহায়তায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে উপরে বর্ণিত ক্রটির সুযোগ নিয়ে ইসলাম প্রচারের সুযোগকে কাজে লাগান। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে ইসলামের প্রচার শুরু করেন।"[২]

চৈতন্যদেবের সমকালে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন শাহ। তার রাজত্বকাল ছিল ১৪৯৩ - ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতান সিংহাসনে বসেছেন, তথাপি তার মনের শান্তি নেই। কেননা হিন্দু প্রজাগণ সুলতানকে উদার চিত্তে গ্রহণ করেননি। তাই সুলতান হুসেন শাহ উজিরকে ডেকে বলছেন —

> "সকল সংগ্রামে আমি বিজয়ী হই। তথাপি হিন্দু প্রজাগণ আমাকে অদ্যপি উদার চিত্তে গ্রহণ করে নাই।"[৩]

কথাটি গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তীও বলেছেন। সুলতান হুসেন শাহকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসক বলা হলেও হিন্দু প্রজা ও রাজকর্মচারীগণ তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন না —

> "হোসেন শাহ, তৎকালে হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ-কালে, তথাকার হিন্দু দেব দেবী ও হিন্দুদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা সকলের মনে ছিল; তজ্জন্য উল্লিখিত রাজ-কর্মচারিগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না।"[৪]

উজির তখন সুলতানকে আশ্বস্ত করে বললেন যাদের প্রতি হিন্দু সমাজের প্রবল আনুগত্য ও ভক্তি রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের রাজ দরবারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। সেই দুজন ব্যক্তি হলেন কুমারদেব গোস্বামীর দুই পুত্র অমর ও সন্তোষ। এই অমর সন্তোষই পরবর্তীকালে রূপ সনাতন নামে পরিচিত লাভ করবে। রূপ সনাতনের পূর্বপুরুষ রূপেশ্বর কর্ণাট প্রদেশের কোনো এক রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে রূপ সনাতনের পিতা কুমারদেব বঙ্গে চলে আসেন এবং গৌড়ের নিকটবর্তী মাধাইপুর নামক স্থানে হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কারের কন্যা রেবতী দেবীকে বিবাহ করেন। কুমারদেব ও রেবতী দেবীর পুত্রদের মধ্যে অমর ও সন্তোষ ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। এই অমর সন্তোষকেই সুলতান তার রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক সুখেন্দুশেখর রায়ের মতে —

> "তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান, জনসংযোগ ও জনহিতকর কার্য্যাবলী সম্পর্কে আমি অবহিত হইয়াছি। তাই তোমাদের ন্যায় এহেন গুণবান, উদারচিত্ত ও জনপ্রিয় যুবককে আমি রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।"[৫]

রাজার এই আজ্ঞা অমর ও সন্তোষ পালন করলেন। এরপর থেকেই অমর ও সন্তোষ গৌড় রাজদরবারে কাজ করতে লাগলেন। রাজদরবারে এসে একজনের উপাধি হল দবির খাস। আর একজনের উপাধি হল সাকর মল্লিক। এদের মধ্যে কে দবির খাস আর কে সাকর মল্লিক এ নিয়ে ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক কেদারনাথ গুপ্ত, সুখেন্দুশেখর রায়, বিকাশ রায়, লায়েক আলি খান প্রমুখের মতে রূপ হলেন সাকর মল্লিক আর সনাতন হলেন দবির খাস। আবার প্রাবন্ধিক অনন্যা গোস্বামী, গোপাল লাহা, এমনকি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের মতে দবির খাস হলেন রূপ এবং সাকর মল্লিক হলেন সনাতন। দবির খাস অর্থাৎ সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারি। সাকর মল্লিক অর্থাৎ অর্থ আধিকারিক বা ফিনান্স অফিসার। দুইভাই উচ্চপদে থাকা সত্ত্বেও তাদের মনের মধ্যে শান্তি বিরাজ করতো না। তাই দুইভাই ব্যাকুল চিত্তে দিনরাত ভাবতেন কী করে এই রাজ বন্ধন থেকে ছিন্ন হওয়া যাবে। এমন সময় সংবাদ পাওয়া যায় নবদ্বীপে চৈতন্য নামের এক ব্যক্তি হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আপামর জনগণকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। সেই সময়ে রূপ ও সনাতন শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে 'দৈন্যপত্রী' নামে পত্র প্রেরণ করেন। রামকেলিতে রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনের অনুকরণে একটি গুপ্ত বৃন্দাবন নির্মাণ করেছেন। এর অন্যতম আকর্ষণ হল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, যা মন্দির কক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন রয়েছে বিশাল কুঞ্জ–শ্যামকুঞ্জ ও রাধাকুঞ্জ। কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা শোভিত কদম্ব কানন। রাজকার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে রূপ ও সনাতন এই স্থানে সময় অতিবাহিত করে থাকেন। সেরকমই একদিন এই গুপ্ত বৃন্দাবনে কথোপকথন কালে শ্রীচৈতন্যের এক পত্র আসে রূপ সনাতনের উদ্দেশ্যে। তাতে লেখা –

> "যদি কোন নারী পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহলে তাহার এমন কোনও আচরণ করা উচিত নহে যাহাতে পতির হৃদয়ে পত্নীর সম্বন্ধে পরপুরুষের প্রেমিক রূপে গণ্য করিবার ভ্রমণ উৎপন্ন হয়। সেই নারী যেমন কর্মেই ব্যাপৃত থাকুক না কেন, তাহার হৃদয়ে যেন সদাসর্বদা স্বীয় পতিদেবতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।"[৬]

এইভাবে সাংকেতিক ভাষায় তাদের দুই ভাইকে আশ্বস্ত করেছিলেন চৈতন্যদেব। এর কিছুদিন পরেই চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন ঘটে। এই আগমনের পেছনে কারণ কী ছিল তা উল্লেখ করেছেন চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ –

> "গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
> তোমা দোহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমণ।"[৭]

অর্থাৎ রূপ সনাতনের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন ঘটেছে। কিন্তু মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকগণ রূপ সনাতনের পাশাপাশি আরও অন্যান্য উদ্দেশ্যের কথাও তাদের প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। সেই উদ্দেশ্যগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হল –

প্রথমত, একথা সর্বজন বিদিত যে রূপ সনাতন তথা সাকর মল্লিক ও দবির খাস ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। এই দুজনকে চৈতন্যদেবের প্রয়োজন ছিল। কেননা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দের মধ্যস্থতায় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর এই উড়িষ্যাকে তৎকালীন সময়ে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন গৌড়ের রাজা হুসেন শাহ। এই আক্রমণের শক্তি দুই ভাই - দবির খাস ও সাকর মল্লিক। সেই শক্তি থেকে দুজনকে সরিয়ে নেওয়াটা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রাবন্ধিক লায়েক আলী খান মনে করেছেন। দুই ভাই গৌড় থেকে সরে গেলে হোসেন শাহ দুর্বল হয়ে পড়বেন, তাই চৈতন্যদেবের গৌড়ে আসার পরিকল্পনা।

দ্বিতীয়ত, চৈতন্যদেব ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভেবেছিলেন যে রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনে দীক্ষিত করতে পারলে পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্মচর্চারও সমৃদ্ধি ঘটবে। এই উদ্দেশ্যেও তাঁর গৌড়ে আগমন।

তৃতীয়ত, গৌড় আগমনের নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল মাতা শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সাধারণত সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সাংসারিক বিষয়ে সমস্ত মায়া বন্ধন ত্যাগ করে নিরাসক্ত চিত্তে বেড়িয়ে পড়েন। কিন্তু চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। গৌড় যাত্রাকালে পথিমধ্যে নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেব শচীমাতার সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাতে শচীমাতা পুত্রের প্রতি একটি নিবেদন জানালেন। চৈতন্য যেন দাদা বিশ্বরূপের মতো একেবারে হারিয়ে না যায়। তাই চৈতন্যদেব মাতাকেই তার থাকার স্থান নির্বাচন করে দিতে বললেন। তখন শচীমাতা চৈতন্যের জন্য নীলাচলে থাকার অনুমতি দিলেন। কেননা ভক্তদের গমনাগমনের মাধ্যমে শচীমাতা সর্বদা পুত্রের খবর পেয়ে যাবেন। মাতার এই আদেশ চৈতন্যদেব শিরোধার্য মনে করলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নীলাচলেই ছিলেন। এইভাবে গৌড়দেশ যাত্রাকালে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য নিয়েও বেড়িয়েছিলেন তিনি।

চতুর্থত, গৌড়ে চৈতন্যদেবের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল আরও গভীর। লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক সুস্মিতা সোমের মতে – চৈতন্যদেব জানতেন যে ইসলামে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের নায়ক একই ব্যক্তি হন। সে সময় এই দুই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। নবদ্বীপে হুসেন শাহের প্রতিনিধি চাঁদ কাজির সঙ্গে চৈতন্যদেব আংশিক ভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু গৌড়ে এসে দবির খাস ও সাকর মল্লিককে নিজের দলে টেনে নিয়ে হুসেন শাহের সঙ্গে সেই সংঘর্ষকে পূর্ণ করলেন। প্রাবন্ধিক সুস্মিতা সোমের উক্তিটি সর্বদা সত্য নয়। গোড়াতে ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিই হয়েছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলে জায়গা থেকে। আর সেই জায়গায় হযরত মুহম্মদ (সাঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই ভাবনাটি ইসলাম ধর্ম উদ্ভাবনের পেছনে সত্য ছিল। কিন্তু ইতিহাস তা বলেনা – রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মনায়ক একই ব্যক্তি হবেন। যদি ইতিহাসের দিকে আমরা লক্ষ করি তবে দেখতে পাবো যে — রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মকে প্রচার ও প্রসার করতে চেয়েছিলেন। ফলে চৈতন্যদেব উক্ত ভাবনাটি ভেবেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রাবন্ধিকের এই ভাবনাটি আমাদের অতিশোয়ক্তি বলে মনে হয়েছে।

পঞ্চমত, চৈতন্যদেব তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি আন্দোলনকে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি অন্যতম কেন্দ্র হল গৌড়। তৎকালীন সময়ে গৌড় বঙ্গের রাজধানী হওয়ায় এই আন্দোলনের ধারা খুব ভালোভাবে এখান থেকে বিকশিত হতে পারবে। এই উদ্দেশ্যও চৈতন্যদেব গৌড়ে ভ্রমণ করেন। তাই রামকেলিতে এসে বৈষ্ণব আন্দোলনের কেন্দ্র তৈরি করা খুব প্রয়োজন ছিল বলে প্রাবন্ধিক বিকাশ রায় মনে করেছেন।

এইসব পটভূমিতেই গৌড়ে আবির্ভাব ঘটে শ্রীচৈতন্যের। তৎকালীন সময়ে গৌড়ের অদূরে অবস্থিত রামকেলি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক সময় রামকেলি ছিল সংগীতচর্চা ও সংস্কৃত চর্চার অন্যতম জনপ্রিয় কেন্দ্র। 'রামকেলি' হল সংগীতের এক সুর। 'রামক্রী' রাগ থেকে সৃষ্ট রামকেলি সুর। প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা সে কথায় বলেছেন —

> "'রামক্রী' থেকে সৃষ্ট 'রামকেলি' একাধারে 'রাগ' ও স্থাননামের দ্যোতক। সংস্কৃত চর্চা, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংগীত চর্চা, গৌড়ীয় নৃত্য, গৌড়ীয় ব্যাকরণ চর্চা, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য চর্চা ব্যাপক ভাবে হ'ত গৌড়-রামকেলিতে, তাই রামকেলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"[৮]

চৈতন্যদেব রামকেলিতে পদার্পন করেন ৯১২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন। ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে। রামকেলিতে আগমনের পর একটি তমাল বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। গৌড়ে এসে চৈতন্যদেব বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। তিনি যে ঠিক কতদিন গৌড়ে ছিলেন এ নিয়ে নানা মতান্তর রয়েছে। কারোর মতে তিনদিন, কারোর মতে চারদিন, আবার কেউ বলছেন পাঁচদিন। চৈতন্যদেব ঠিক কতদিন গৌড়ে অবস্থান করেছিলেন এ নিয়ে নানান মতামত থাকলেও তাঁর ভ্রমণের গুরুত্ব সময়ের প্রেক্ষিতে যাচাই হয়নি, হয়েছে গৌরবের গুরুত্বে। গৌড় রাজ হুসেন শাহ তার রাজপ্রাসাদ থেকে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখছেন। এমন সময় দূরে গঙ্গার তীরে দেখতে পেলেন এক মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, তাঁকে অনুসরণ করে পিছনে বিশাল জনস্রোত ক্রমশ গৌড়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সন্ন্যাসীর এই আগমনে সুলতান হুসেন শাহ

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অমাত্যরা জানালেন তিনি একজন সামান্য হিন্দু সন্ন্যাসী মাত্র। তিনি রাজকার্যের কিছু ক্ষতি করবেন না। এতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন হুসেন শাহ। চৈতন্যদেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে গৌড়ে এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হল। গৌড়ের রামকেলিতে এসে চৈতন্যদেব রাজকর্মচারী অমর ও সন্তোষ – এই দুই ভাইয়ের নাম পাল্টে রাখলেন রূপ ও সনাতন। পরবর্তীকালে এই নামেই তাঁরা পরিচিতি লাভ করেন। এরপর থেকেই রূপ ও সনাতন চৈতন্যদেবের শিষ্য হয়ে উঠলেন। চৈতন্যদেব গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই রূপ বাদশাহ হুসেন শাহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর রাজকার্য পরিত্যাগের প্রার্থনা জানান – কেননা তার মধ্যে বৈরাগ্যভাবের জন্ম নিয়েছে, তাই রাজসভার কাজ করা আর তাঁর দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। রূপ তাঁর বাকি জীবন বৃন্দাবনে গিয়ে হরিসাধনায় উৎসর্গ করতে চান। সুলতান তখন চিন্তা করলেন যে – রাজকার্যের প্রতি যার এমন অনীহা জন্মেছে তাকে রাজকার্যে বেঁধে রাখা লাভ হবে না। অতএব তাকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়। তাই সুলতানের আদেশ পাওয়ার পর রূপ বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বাকি জীবন কৃষ্ণের লীলাভূমির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োজিত করলেন। রূপের চলে যাবার পর সনাতনের মধ্যেও বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। তার মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত রাজসভার কাজে অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন তিনি। সনাতনের এই আচরণে সুলতানের মনে তাঁর প্রতি সন্দেহ জন্মায়। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সুলতান স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে – সনাতন একান্ত মনে ভাগবত পাঠ করছেন এবং তাঁর চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু নির্গত হচ্ছে। সুলতানকে মিথ্যে বলার অপরাধে হুসেন শাহ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করেন। বেশ কিছুদিন কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়েছিল সনাতনকে। তারপর একদিন কারারক্ষী হবু শেখের মাধ্যমে বৃন্দাবন থেকে রূপ প্রেরিত পত্র পেয়ে সনাতন কিছুটা আশ্বস্ত হন। পত্রে লেখা — বিশ্বস্ত মুদীর কাছে রূপ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে গিয়েছেন, সেই মুদ্রা কাজে লাগিয়ে সনাতন যেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে সমকালীন সময়ে হুসেন শাহ উড়িষ্যা প্রদেশ আক্রমণ করতে গিয়ে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হবু শেখের মধ্যস্থতায় কারা থেকে পালাতে সক্ষম হন সনাতন। অবশ্য এর জন্য হবু শেখকে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিতে হয়েছিল। বাকি তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাঁর যাত্রাপথের কাজে লাগে। এইভাবে প্রথমে রূপ ও পরে সনাতন - দুই ভাই গৌড় রাজদরবারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চৈতন্যদেবের অনুসরণে বৃন্দাবনে গিয়ে বাকি জীবন কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন।

চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন ও রূপ সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিষয়টি সব জীবনীকার তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। বৃন্দাবন দাস গৌড় যাত্রার কথা উল্লেখ করলেও রূপ সনাতনের কথা উল্লেখ করেননি। একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজই এই দুইজনের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। কারণ তিনি পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ সনাতনের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা শুনেছিলেন। লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক অনন্যা গোস্বামী সে কথায় বলেছেন তাঁর প্রবন্ধে —

> "... কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ সনাতনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকেই প্রকৃত ঘটনা শুনেছিলেন। সুতরাং এ ঘটনাটি সঠিক এবং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যও অপরিসীম।"[৯]

এইভাবে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকরা তাঁদের কলমে চৈতন্য জীবনের একটি বিশেষ পর্যায় – গৌড় ভ্রমণের পর্বটিকে তাঁদের প্রবন্ধে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা, কমল বসাক, অরুণকান্তি ভট্টাচার্য, সুস্মিতা সোম, সুখেন্দুশেখর রায়, বিকাশ রায়, আইরিন শবনম প্রমুখেরা প্রত্যেকেই স্থানিক ব্যক্তি এবং স্থানিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাদের প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে। কারণ 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি চৈতন্যজীবনী বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলির মধ্যে চৈতন্যের জীবনের সামগ্রিক দিক ফুটে ওঠায়, একটি ছোট্ট অংশ হিসেবে গৌড় ভ্রমণের পর্বটিকে দেখানো হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিকরা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে যা আছে তার বাইরেও তথ্য সংগ্রহ করে চৈতন্য আগমনের প্রেক্ষিতগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি, রামকেলির ইতিহাস, রূপ সনাতনের

সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে আরও একটি দিক ধরা পড়েছে — সুলতান হুসেন শাহ সম্পর্কে। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান হুসেন শাহ ছিলেন বহু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সাহিত্যিক কাব্য রচনা করে নানান উপাধিও পেয়েছেন। এটি ছাড়াও তাঁর আরও একটি দিক মূল ইতিহাসের ধারায় সেভাবে বিচার্য হয় না। কিন্তু স্থানিক ইতিহাসচর্চার মধ্যে চৈতন্যদেবের আগমনের কারণগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে – হুসেন শাহকে যতটা ইতিবাচক শাসক হিসেবে আমরা সাধারণভাবে দেখি, তা কিন্তু সর্বদা সত্য নয়। সেটি আংশিক সত্য মাত্র। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণকালে বহু মন্দির-মঠ ধ্বংস করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের নাম সংকীর্তন করার ওপরেও বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন। কেননা তাঁর প্রতিনিধি হয়েই নবদ্বীপে চাঁদ কাজি চৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাই প্রাবন্ধিকদের এই বিশ্লেষণগুলি ইতিহাস রচনায় মূল্যবান সংযোজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। এছাড়াও প্রাবন্ধিকরা চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য নিয়েও নানান কথা আলোচনা করেছেন। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর রহস্য নিয়ে চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে বিশেষ কিছু বলেননি। তবে জয়ানন্দ ও লোচনদাস তাঁদের ‘চৈতন্যমঙ্গল’-এ চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট কথা বলেছেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ আছে —

“আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।”[১০]

লোচনদাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ বলেছেন —

“তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।”[১১]

অর্থাৎ পুরীতে রথ যাত্রার দিন রথের সামনে নৃত্যরত অবস্থায় রথের চাকার সামনে চলে আসেন তিনি। সেই রথের চাকার আঘাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। আর দ্বিতীয় মতামতটি হলো পুরীর সমুদ্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে বিলীন হন চৈতন্যদেব। উপরোক্ত এই দুটি কারণ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি মতামত রয়েছে চৈতন্য মৃত্যুর — চৈতন্যদেব যেভাবে ধর্মসংস্কার করে জাত পাতের ভেদাভেদ ও কুসংস্কার দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত হেনেছিল। তাই চৈতন্যদেবকে তারা এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবার মন্ত্রণা কষছিল। সেই মতো একদিন রাতে যখন তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করতে যান, তখন এই মৌলবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষেরা তাঁকে হত্যা করে সেই মন্দিরের মেঝেতে তাঁর সমাধিস্থল খুঁড়ে রাতারাতি মৃতদেহটিকে সমাধিস্থ করে দেয়। আর চারিদিকে রটিয়ে দেয় যে চৈতন্যদেব জগন্নাথ প্রভুর সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন। তৃতীয় এই মতামতটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মানতে চান না। তাঁর মতে —

> “এই শেষোক্ত বর্ণনাটি নিশ্চয়ই গল্পবুভুক্ষু সাধারণ মানুষ উর্বর কল্পনাপ্রসূত, পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী ছিলেন, পুরীর বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ওড়িয়া ভক্ত মহাপ্রভুকে গুরুর মতো ভক্তি করিতেন, নিত্য তাহার দর্শনালাভের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করিয়া সমাহিত করার লোমহর্ষক ডিটেকটিভ গল্প কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।”[১২]

কিন্তু মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিন প্রাবন্ধিক অরুণকান্তি ভট্টাচার্য এই মতামতটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে চান না। চৈতন্যদেব জগন্নাথ প্রভুর সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন - কথাটি রটানোর পেছনে প্রাবন্ধিক কারণ দেখিয়েছেন যে —

> “চৈতন্যদেবের দেবত্ব বা অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচার করা। তিনি যে রক্ত, মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন না, এঘটনা প্রমাণ করা, কারণ তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য অপেক্ষা যদি মানব প্রেম এবং মানব মাহাত্ম্য

> প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে ভক্তবৃন্দের কাছে তাঁর দৈব্যসত্ত্বা ম্লান হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ তাকে নিজের মত করে দেখতে ভাবতে শিখবে, তাঁর অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হবে।”[১৩]

কারণ এইসব ধর্মব্যবসায়ীরা চায় না চৈতন্যদেবের মানবিক মহিমা প্রকাশিত হোক। তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করতে হবে।

মালদা জেলার লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চৈতন্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি চৈতন্যদেবের জীবনের ইতিহাস তথা সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর প্রভাব বিষয়ক তথ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যা বাংলার ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। চৈতন্যদেবকে ঘিরে রয়েছে নানান ইতিহাস, নানান কিংবদন্তি। এর মধ্যে কোনটি ইতিহাস আর কোনটি কিংবদন্তি প্রবন্ধগুলি পাঠে পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আবার কোনো কোনো জায়গায় ইতিহাস ও কিংবদন্তি মেলামেশা করে এক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগে গৌড়ে চৈতন্যদেবের আগমন ও তাঁকে ঘিরে গৌড়ের জনজীবনে যে প্রভাব তার কথা প্রবন্ধ পাঠে যেমন জানা যায়, তেমনি জানা যায় মালদাবাসীর মনে এক নির্ভীক সত্তা জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। গৌড়ের প্রজাদের মধ্যে হিন্দু-বিদেশি শাসকের সকল ভয়কে উপেক্ষা করার সাহস যুগিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তাছাড়া চৈতন্যদেবের আগমনের পর থেকে তাঁকে স্মরণ করেই রামকেলিতে প্রতিবছর জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন নানান মানুষ। মেলাকে ঘিরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য তা চৈতন্যদেবের প্রভাবেই আবর্তিত হয়েছে। ফলে বাংলা সামগ্রিক চৈতন্যচর্চাতেও এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

Reference:

১. গোস্বামী, অনন্যা, শ্রীচৈতন্যের গৌড় পরিক্রমা, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ২৮

২. লাহা, গোপাল, রামকেলিতে ভক্তিআন্দোলন : শ্রীচৈতন্য, রূপ-সনাতন, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ৫৭

৩. রায়, সুখেন্দুশেখর, রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ, উৎসারিত আলো, সম্পা. দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ১৮

৪. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৩৯

৫. রায়, সুখেন্দুশেখর, রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ১৯

৬. রায়, সুখেন্দুশেখর, রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ২০

৭. কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ – ২০১৯, গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ১৭৩

৮. লাহা, গোপাল, রামকেলিতে ভক্তিআন্দোলন : শ্রীচৈতন্য, রূপ-সনাতন, উৎসারিত আলো, সম্পা. দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ৫৮

৯. গোস্বামী, অনন্যা, শ্রীচৈতন্যের গৌড় পরিক্রমা, উৎসারিত আলো, সম্পা.- দীপঙ্কর দাসসরকার, ৪র্থ বর্ষ/২য় সংখ্যা - ২০১৩, মালদা, পৃ. ৩০

১০. জয়ানন্দ, জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', সম্পা.- বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ - জুন ২০১৬, ১ পার্কস্ট্রীট কলকাতা - ৭০০০১৬, পৃ. ২৩৪

১১. লোচনদাস, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, সম্পা. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ: শ্রাবণ ১৪০৭, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা - ০৬, পৃ. ৩৩৩

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৬, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ২০৭-২০৮

১৩. ভট্টাচার্য, অরুণ কান্তি, শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে অবস্থানের পেছনে কী কোন গোপন অভিসন্ধি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল?, গৌড় মালদা সংবাদ, সম্পা. অভিজিৎ চৌধুরী, শারদীয়া ১৪১৫, মালদা, পৃ. ২৯